একক ৪ □ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

গঠন

৪.৪.০ উদ্দেশ্য

৪.৪.১ প্রস্তাবনা

৪.৪.২ প্রারম্ভিক কথা

৪.৪.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিত

৪.৪.৪ বলকান জাতীয়তাবাদ

৪.৪.৫ আন্তর্জাতিক সংকট ঃ হেগ কনফারেন্স থেকে বলকান যুদ্ধ

৪.৪.৬ ওয়েল্টপলিটিক ও নৌবাদ

৪.৪.৭ প্রাচ্য সমস্যা ঃ সোরাজেভো হত্যাকাণ্ড ঃ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা

৪.৪.৮ যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র

৪.৪.৯ জার্মানির নৌযুদ্ধ

৪.৪.১০ যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ

৪.৪.১১ যুদ্ধের দায়িত্ব

৪.৪.১২ যুদ্ধ শেষের প্রস্তুতি ঃ উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত

৪.৪.১৩ ফলাফল

৪.৪.১৪ সারাংশ

৪.৪.১৫ অনুশীলনী

৪.৪.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.৪.০ উদ্দেশ্য

যুদ্ধ, মানুষের সনাতন প্রতিষ্ঠান, তার সবচেয়ে প্রাচীনতম অভিশাপগুলির একটি। যুদ্ধ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করে, উন্নয়ন ব্যাহত করে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়। মানুষকে ধ্বংস করা, সম্পত্তির বিনাশ ঘটানো আরেক নাম যুদ্ধ আর পরিণতি হল দেশের সাথে দেশের শত্রুতা, জাতির সঙ্গে জাতির বৈরিতা, আর গার্হস্থ্য অস্তিত্বে রোগ শোক-অর্থাভাব, অন্নাভাব ও কর্মহীনতার প্রকোপ বৃদ্ধি। যুদ্ধ কোনদিন মানুষের শুভ শক্তি হতে পারে না। এই সত্য

আমরা আশৈশব জেনে আসি নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ সত্যের যে ভুবনায়িত রূপ তার global perspective—আমরা এই এককের মধ্যে দিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখব কেমন করে পূর্ব ইউরোপের জাতীয়তাবাদ—যাকে আমরা বলকান জাতীয়তাবাদ বলে থাকি—সেই জাতীয়তাবাদের ধারা কি বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছিল যাকে প্রশমন করা পশ্চিমী শক্তিগুলির পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। আর দেখব সমস্ত ইউরোপীয় মহাদেশ দুটি সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হয়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যার ফল আসন্ন ঝড়ের, অশনি সংকেত বিশ্বময় সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে তুলেছিল—সাম্রাজ্যবাদের লোভ আর হানাহনি গ্রাস করতে চাইছিল মানুষের গোটা সভ্যতার দুনিয়া জোড়া রূপটিকে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত নানা রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি—ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া—বনাম অক্ষশক্তি—জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালি—এই তিন দেশের ঐক্যবদ্ধ লড়াই এমন এক বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় এনে দিয়েছিল যার প্রভাব বহুদেশের স্থিতিশীলতাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, এই বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতেই রাশিয়ার জারতন্ত্রের ভিত নড়ে গিয়েছিল, জার্মানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লীগ অফ নেশনস্ নামে এক অভিনব বিশ্বসংগঠনের জন্ম হয়েছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজের কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল হাঙ্গেরি, ইউগোশ্লভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ। ইউরোপের পুরানো মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছিল—আর পরিবর্তন হয়েছিল মানুষের মনের, তার সমাজব্যবস্থার, তার ম্যূলবোধের। এত বড় পরিবর্তন এর আগেই পৃথিবীতে আর কোনদিন হয়নি। বিশ্বময় এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতকে বোঝার জন্য আমরা এই এককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়ব।

৪.৪.১ প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দী ছিল বিস্ময়করভাবে যুদ্ধের শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন দুটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যা সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছিল (১৯১৪-১৮১৮ এবং ১৯৩৯-১৯৪৫)। মনে রাখতে হবে যে এই যুদ্ধ দুটি ছিল মূলত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিজেদের যুদ্ধ যা তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে। আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই হয়ে দাঁড়ায় কোন কোন দেশের পক্ষে শান্তির চেয়ে বড় ঐতিহ্য—কোন কোন মুহূর্তে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। একজন পুরানো দিনের ঐতিহাসিক এই ব্যাপারটি অনুধাবন করে একটি বক্তব্য রেখেছিলেন যার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির এই যুদ্ধবাজ মানসিকতাকে বড় সুন্দর করে তিনি বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে উনিশ শতকের ইউরোপের দেশগুলি—সে স্বৈরাচারী হোক আর গণতান্ত্রিক হোক—বিশ্বাস করত যে যুদ্ধ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক অস্ত্র। ফরাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতার বাণীটি যুদ্ধের দ্বারাই তাড়িত হয়েছিল। নেপোলিয়নের স্বৈরাচারকে রুখে দিয়েছিল যুদ্ধ। যুদ্ধের মাধ্যমেই ইটালী ও জার্মানির ঐক্য সাধিত হয়েছিল। এই একই মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র তার ফেডারেশন গড়তে পেরেছিল। এই পথ ধরেই পাশ্চাত্য প্রবেশ করেছিল প্রাচ্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে। ["The nations of the nineteenth century, whether autocratic or democratic, believed that war was an effective political weapon. War had propagated French political freedom, war had cheeked the tyranny of a Napoleon, by that means Italy and Germany had found union, the united states justified federation, by the same path the West had entered into the wealth of the East."—D. M. Ketelbey. A History of Modern Times From 1789 to the Present Day] মোটের উপর একটা যুগ তৈরি হয়েছিল যে যুগ মনে করত যে যুদ্ধ হচ্ছে একটা প্রয়োজনীয় অস্ত্র। এই অস্ত্রকে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯১৪ সালে যে প্রায় সারা পৃথিবীই যুদ্ধের আওতায় এসে পড়েছিল। বাদ পড়েছিল শুধু নেদারল্যান্ডস্ ও তার সাম্রাজ্য, **নেদারল্যান্ডস্** : ওলন্দাজ ভাষায় বলা হয় নেডারল্যান্ড (Nederland) বা নিম্নভূমি। ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি ছোট

রাজ্য যার আয়তন হল ১২,৫৩০ বর্গ মাইল। এই আয়তনের এক তৃতীয়াংশ সমুদ্র সমতলের নীচে অবস্থিত। সেইজন্য তাকে বলা হয় নিম্নভূমি—Nederland—ইংরেজি ভাষায় Netherlands। এক সময়ে বেলজিয়াম রাজ্য (Kingdom of Belgium) এবং লুকসেমবুর্গের রাজ্যকেও (Grand Duchy of Luxemburg) নেদারল্যান্ডসের অন্তর্ভুক্ত ধরা হত। নেদারল্যান্ডস রাজ্যের দুটি বড় প্রদেশ হল (এর মোট প্রদেশ এগারোটি) উত্তর হল্যান্ড ও দক্ষিণ হল্যান্ড (North Holland and South Holland)। এই দুই প্রদেশের নাম থেকেই সম্পূর্ণ রাজ্যটিকে হল্যান্ড বলা হয়। স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, কলোম্বিয়া, জেনেজুয়েলা এবং মেক্সিকো। পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধই হল প্রথম যুদ্ধ যেখানে শুধু পেশাদারী সৈন্য ও নৌবাহিনীই লড়াই করেছিল তা নয়, এক দেশের ও একজাতির মানুষ সামগ্রিকভাবে লড়াই করেছিল আরেক দেশ ও আরেকজাতির মানুষের সঙ্গে। আর তার সঙ্গে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে ব্যবহৃত হল এক সঙ্গে বহু মানুষ ধ্বংস করতে পারার অস্ত্র (weapons of mass slaughter)। এই যুদ্ধে সরাসরিভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল ইংল্যান্ড. ফ্রান্স ও রাশিয়া যারা নিজেদের মধ্যে একটি অলিখিত মৈত্রী বন্ধন (যাকে বলা হয় আঁতাত বা entente) রচনা করেছিল। তাদের সমর্থন করেছিল জাপান (১৯১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে)। যুদ্ধের যে কোন বিষয়ে এদের মিত্র শক্তি বা Allied Powers বলে বর্ণনা করা হয়। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল দুই ইউরোপের কেন্দ্রগত শক্তি—জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এবং তুরস্ক। ১৯১৫ সালে বুলগেরিয়া তাদের সমর্থনে যুদ্ধে যোগ দেয়।

৪.৪.২ প্রারম্ভিক কথা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে কোন প্রারম্ভিক আলোচনায় বুঝতে হবে মিত্রশক্তি (Allied Powers) ও কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের (Central Powers) সুবিধা-অসুবিধা কি ছিল যা নিয়ে তারা যুদ্ধের প্রাথমিক ঘটনাবলীর মোকাবিলা করতে চেয়েছিল। ভৌগোলিক ভাবে মিত্রশক্তি ছিল অনেক ছড়ানো ও বহুধা বিভক্ত শক্তি। তাতে মনে হতে পারে যে এর দ্বারা মিত্রশক্তির সুবিধাই হয়েছিল কারণ এতগুলি বান্ধব রাষ্ট্র পরিকল্পিত ভাবে কেন্দ্রীয় শক্তিদের বেষ্টন করে রাখতে পারত। বিপক্ষ শক্তিকে ঘিরে ফেলা যে কোন অর্থেই যুদ্ধের সাফল্য বলে চিহ্নিত হতে পারে। বাস্তবে অবশ্য তা কখনোই হয়নি। মিত্রশক্তির বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধান তাদের পক্ষে একটি পরিকল্পনা মাফিক সাধারণ কাজ (Common action) করায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিত্রশক্তির যেমন কোন সাধারণ লক্ষ্য ছিল না, সেরকম ছিল না একজন সর্বোচ্চ সেনাপতি। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ প্রথম থেকে সুপরিকল্পিত কার্যবিন্যাসের ছবিটি তুলে ধরতে পেরেছিল—পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণকে আগের থেকে সাজিয়ে তোলা রেল ব্যবস্থার মাধ্যমে সফল করার সমস্ত দক্ষতাও তারা দেখিয়েছিল। আসলে প্রথমদিকে মিত্রশক্তির আয়জন ছিল শ্লথ, তাদের গতিবিধি (movements) ছিল অসংগঠিত (irregular) এবং সময়ের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয় (ill-timed)। বিশেষ করে রাশিয়া তার সৈন্য সঞ্চালনে এবং তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অসম্ভব দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় দিয়েছিল। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া প্রথম থেকেই অত্যন্ত দ্রুত তাদের সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা দেখিয়ে অতি অল্প সময়ে অল্প সংখ্যক সৈন্যব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের আত্মরক্ষার যে ছবিটি তুলে ধরেছিল তা প্রথম পর্বে যুদ্ধের সাধারণ ধারার মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। বস্তুতপক্ষে—ঐতিহাসিকরা মনে করেন কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির সংগঠন ও স্ট্র্যাটেজি এতই সরল ছিল যে যুদ্ধের প্রথম দিকে লড়াই করার মূল উদ্যোগ (initiative) এবং যুদ্ধের কর্মতৎপরতার প্রধান ধারা (lines of operation) তাদের হাতেই ছিল।

কেন্দ্রীয় শক্তিগুলি জানত যে তাদের এই প্রাথমিক সাফল্য মাত্র সাময়িক। তাদের বিপক্ষের শক্তিরা এত ছড়ানো, এত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নৌবহরে এত শক্তিশালী যে বেশীদিন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যদি মিত্র শক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠন

ও স্ট্র্যাটেজিকে প্রতিরোধ দিতে পারত তবে তাদের মধ্যে বিরোধহীন এমন এক সাধারণ ঐক্য গড়ে উঠত। এমন এক কেন্দ্রীয় সাধারণ (common) ও সর্বোচ্চ (supreme) নেতৃত্ব গড়ে উঠত যার মোকাবিলা করা অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও জার্মানির পক্ষে সম্ভব হত না। তাই প্রথম কেন্দ্রীয় শক্তি বর্গের লক্ষ্য ছিল অতি দ্রুত কাজ যাতে মিত্রশক্তি সংগঠিত হয়ে তাদের সমস্ত রসদ ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় শক্তিদের পূর্ব পশ্চিম থেকে ঘিরে ফেলতে না পারে। কেন্দ্রীয় শক্তিগুলি—জার্মানি ও অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী— প্রথম থেকে চেষ্টা করেছিল যাতে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই বিপরীত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। মিত্রশক্তি যে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গকে ঘিরে ফেলে যুগপৎভাবে তাদের পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে তাদের লড়াইয়ের সামর্থ্যকে নষ্ট করে দেবার পরিকল্পনা করবে এ কথা অনুমান করেই তারা আগে থেকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে নিজেদের জয়কে নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছিল। অতএব তাদের পরিকল্পনা ছিল সমস্ত শক্তি দিয়ে ফ্রান্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিস্তেজ করে দেওয়া এবং সম্ভব হলে যুদ্ধের থেকে হটিয়ে দেওয়া যাতে পূর্ব দিক থেকে রাশিয়া আক্রমণ করার আগেই পশ্চিম সীমান্তকে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তাহলেই পশ্চিম সীমান্তের সফল জার্মান সৈন্যদের তারা পূর্ব সীমান্তে আনতে পারবে—সম্ভাব্য রুশ আক্রমণকে ঠেকাতে পারবে।

৪.৪.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিত

১৯১২-১৩ সালে দুটি বলকান যুদ্ধ (Balkan Wars) — একান্তভাবেই আঞ্চলিক দুটি যুদ্ধ ছাড়া মোটামুটিভাবে ১৮৭১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সামান্য অধিক চার দশক সময় ছিল ইউরোপের শান্তির সময়। শুধুমাত্র ১৮৭৭ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ সামান্য উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও বড় মাপের কোন শান্তি বিঘ্ন হওয়ার ঘটনা এই সময়ে ঘটেনি। তা সত্ত্বেও ইউরোপের ছয়টি 'বৃহৎ শক্তির' (Great Powers) মধ্যে উত্তেজনা বহাল ছিল এবং ভেতরে ভেতরে তা বাড়ছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত সমঝোতা বা আঁতাত (Entente) গঠন করে একটা মিত্র শক্তির জোট রচনা করেছিল। অন্যদিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও ইটালী নিজেদের মধ্যে একটা ত্রিশক্তির জোট তৈরি করে ইউরোপীয় মহাদেশের মধ্যভাগের একটি কেন্দ্রীয় শক্তি জোট রচনা করল। এই দুই জোটই ইতিহাসে ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) ও ট্রিপল এলায়েন্স (Triple Alliance) নামে বিখ্যাত। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই সমস্ত ইউরোপ দুটি সশস্ত্র শিবিরে (armed camps) বিভক্ত হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই শিবির ভাগের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়নি। ১৮৯০ সাল বিসমার্ক (Bismarck) জার্মানির পররাষ্ট্রনীতির নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রক ছিলেন। তিনি এই ধারণা প্রচার করেছিলেন যে জার্মানি হচ্ছে 'তৃপ্ত রাষ্ট্র' (Satiated State)। এতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ধারণা জন্মেছিল যে জার্মানি বাহুবলে আর মহাদেশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে দেবে না। শুধুমাত্র ফ্রান্স ১৮৭০ সালের সে দানের যুদ্ধে জার্মানির হাতে পরাজিত হয়ে এবং তাকে আলসাস-লোরেন নামক অঞ্চলের ভূখণ্ড ও মানব-সম্পদকে প্রদান করে যে নিঃসীম অপমানের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল, তার থেকে মুক্তি খোঁজা, এবং সেই খোঁজার মধ্য দিয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ হওয়া তার পক্ষে অযৌক্তিক ছিল না। ইংল্যান্ড এই সময়ে এক স্ব-আরোপিত নিঃসঙ্গতার (isolation) মধ্যে মগ্ন ছিল। ফলে হঠাৎ করে ঝড় ওঠার কোন সম্ভাবনা তখন ইউরোপীয় রাজনীতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

বিসমার্ক সতর্ক কূটনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডকে কোনভাবে অসন্তুষ্ট করেননি বা বিচলিত হতে দেননি। ১৮৭০ সালে জার্মানির ঐক্যভবনের ফলে ইউরোপে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাকেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা ধরে নিয়ে তিনি মহাদেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ১৮৯০ সালে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জার্মান বৈদেশিক কূটনীতির সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক হলেন *কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম* (Kaiser William II)। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। তাঁর স্বপ্ন ছিল জার্মানিকে ইউরোপের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ শক্তি শুধু নয় একটি বিশ্ব শক্তিতেও রূপান্তরিত করা। বিসমার্ক জার্মানিকে একটি বৃহৎ মহাদেশীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করেই ক্ষান্ত ছিলেন, তাকে বিশ্বশক্তি করার বাসনা তাঁর ছিল না, কারণ তিনি জানতেন যে তার দ্বারা ইউরোপের সনাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নাড়া খাবে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, জার্মানির জন্য তিনি বহির্বিশ্বে উপনিবেশ খুঁজছিলেন এবং বিসমার্কের 'তৃপ্ত রাষ্ট্রের' নীতিকে পরিহার করে তিনি দুর্বার অগ্রগতির—তার ভাষায় Full steam Ahead এর কথা বলতেন। উপনিবেশ দখলের স্বপ্ন দেখার অর্থ হল নিজের নৌ-শক্তিকে বৃদ্ধি করা যার অর্থই হল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের—বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সাথে নতুন করে সামাজিক, বাণিজ্যিক ও নৌশক্তির প্রতিযোগিতায় যাওয়া। বিসমার্ক জানতেন যে এ প্রতিযোগিতার অর্থ হল বিশ্বশক্তির পুনর্বণ্টন—একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় 'nothing less than a readjustment of world-power'। তাই তিনি তা এড়াতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদ্বয় ডেরি ও জার্মান [T. K. Derry and T. L. Jarman, The European world 1870-1961, 1965.p.150] বলছেন যে যখন বিসমার্কের সাধারণ বুদ্ধিজনিত প্রভাব (commonsense influence) যখন অপসারিত হল তখন জার্মানির 'জাতীয় চেতনা শক্তির জন্য শক্তির বোধ ('national cult of power for power's sake') উজ্জীবিত হল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জার্মানি তার সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কঠিন শৃঙ্খলা ও দৃঢ় কার্যপ্রণালী এবং সফল বাণিজ্যিক উদ্যোগ থেকে লব্ধ রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ("For Germany in the early Twentieth Century was above all a land of economic prosperity and self-confidence, based upon a discipline and hard work in all classes of society and the skilful exploitation of political strength for commercial advantage"—Derry and German, p. 151)। জার্মানির ভেতরে আত্মপ্রকাশ করেছিল অর্থনৈতিকভাবে সফল ও আত্মপ্রত্যয়শীল দেশ। এই দেশের কর্ণধার ছিলেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম। তিনি এই নবোদিত শক্তির উদ্যোগকে বৈদেশিক গৌরব অর্জনের কাজে লাগাতে চাইছিলেন। ইউরোপীয় মহাদেশে সমস্ত দেশ ও জাতির মনে জার্মানির লৌহশক্তি, বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহ নীতি' ('Blood and Iron policy') আতঙ্ক জাগিয়েছিল। এবার কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সাম্রাজ্যবাদী নীতি নতুন আশঙ্কার সৃষ্টি করল। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন যে এটি সবচেয়ে জঘন্যতম আশঙ্কা—অনিশ্চিতের আশঙ্কা—It was the wors kind of fetar : fers of the unknown (Brett)। কাইজারের অস্থির শক্তি কোন দিকে ধাবিত হবে কেউ জানতনা। অনিশ্চিত আশঙ্কায় সমস্ত জাতি নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগল। প্রকাশ্যে ও গোপনে অস্ত্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এই পরিবেশে যে কোন বিশ্ববিবাদের মীমাংসা যে আর অস্ত্র ছাড়া হবে না। তা বোঝাই যাচ্ছিল। আপাত শান্তির অন্তরালে এইভাবে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল।

৪.৪.৪ বলকান জাতীয়তাবাদ

ইউরোপের পূর্বে ও দক্ষিণ পূর্বে নানা জাতির মানুষ বাস করত। এদের মধ্যে ছিল মেজর (magyar—উচ্চারণ 'মেগিয়ার' নয়), চেক, সার্ব শ্লোভ্যাক, ক্রোট ইত্যাদি মানুষ যারা সবাই ছিল এথ্‌নিক (ethnic) বিভাজনে স্ল্যাভ (slav) জাতির অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে কোন কোন মানুষ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কেউ ছিল তুর্কী অটোমান সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত মানুষ। উনিশ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে এই সব মানুষদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ইউরোপে নেপোলিয়নের সময় থেকেই জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এইবার জাতীয়তাবাদ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের স্ল্যাভজাতির মানুষদের গ্রাস করল। জাতীয়তাবাদ ছিল উনিশ শতকের নতুন আত্মচেতনা, আর এই আত্মচেতনাই বলকান অঞ্চলকে সামগ্রিকভাবে ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অঞ্চল করে তুলল। বলকান অঞ্চলের মানুষরা ছিল বেশিরভাগই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। তাদের আনুগত্য ছিল পূর্বের অর্থোডক্স